জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম - ৩০ শে নভেম্বর ১৮৫৮ / মৃত্যু - ২৩ শে নভেম্বর ১৯২৩

পশ্চাৎপট।।

জগদীশচন্দ্র বসুর জীবন এক ধারাবাহিক সাধনার ইতিহাস। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে নভেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে তাঁর জন্ম হয়। বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু আর পাঁরজন সমপদস্থ আমলার সঙ্গে তাঁর কিছু তফাৎ ছিল। তাঁর অনেকরকম সমাজসেবামূলক কর্ম ছিল বলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব রেখে তিনি চলতেন না। তাঁর সন্তানেরা ভাগ্যবানের ঘরে জন্মেছে বলেই সাধারনের থেকে নিজেদের আলাদা বলে ভাবুক তা তিনি চাইতেন না। সেইজন্যই তিনি শিশুপুত্র জগদীশচন্দ্রকে প্রথম থেকেই বড়দরের ইংরাজি স্কুলে দিয়ে উন্নাসিক করতে চাননি। ছেলের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেছিলেন গ্রামের পাঠশালায় যেখানে সে চাষী বা জেলের ছেলেদের সঙ্গে পড়ত। এবং তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব পাতাত। শুধু তাই নয় শিশুটির দেখাশোনার ভার তিনি দিয়েছিলেন এক জেলফেরত ডাকাতের হাতে। লোকটি এককালে ভগবানচন্দ্রের দ্বারাই দণ্ডিত হয়েছিল এবং জেল খেটে ফিরে এসে তাঁর কাছেই নিজের বেঁচে থাকার উপায় করে দিতে বলেছিল। এহেন পিতার সন্তান জগদীশচন্দ্র যে শৈশব থেকেই স্বদেশানুরাগ ও মহৎ মূল্যবোধের অধিকারী হয়ে জীবন শুরু করবেন এ তো স্বত:সিদ্ধ।

বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বছর এগারো বয়সে জগদীশচন্দ্রকে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আনা হল। তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছিল সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজ। এখানকার পাঠ শেষ করে ১৮৮০ তে তিনি গেলেন লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ডাক্তারি পড়তে। শারীরিক কারণে অল্পদিন পরেই তিনি ডাক্তারি পড়া ছাড়তে বাধ্য হলেন। হয়ত তাঁর মনও এতে সায় দিচ্ছিল না। কারণ তাঁর জীবনের পরবর্তী ঘটনাসাক্ষ্যে দেখা যায় যে তাঁর সাধনার ক্ষেত্রটি ছিল অন্য। যাই হোক সুস্থ হবামাত্র তিনি লন্ডনের ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্তি হয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাতায়াত আরম্ভ করলেন। মন দিয়ে শুনতে লাগলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে বড় বড় বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা। তারপর দ্বিতীয় বছরে পদার্থ, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করে দিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একই সঙ্গে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বোক্ত তিন বিষয়ে স্নাতক এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে ট্রাইপ্স পাশ করে বেরোলেন। পরের বছর ফিরলেন স্বদেশে।

কর্মজীবন।।

এবার শুরু হল তাঁর কর্মজীবন। ছাব্বিশ বছরের কৃতবিদ্য যুবক প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়ে দেখলেন সেখানে চলছে এক আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁরই সমস্তরের ইউরোপীয় অধ্যাপক সমপরিমাণ কাজ করেও বেতন পাচ্ছেন তাঁর তিনগুণ বেশি। তিনি এই প্রথার প্রতিবাদ করলেন নিজস্ব প্রণালীতে। তা হল তিনি পড়ানো ও অন্যান্য কাজ করতে লাগলেন নিষ্ঠার সঙ্গে, কিন্তু বেতন নিলেন না। শেষে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা এর প্রতিকার হয়েছিল বটে, কিন্তু এরকম ঘটনা সেকালে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। শাসক শাসিতে বৈষম্যমূলক ব্যবহারই ছিল দস্তুর। এ ছাড়া আরও একটা অন্যায় সেকালের বিজ্ঞানসাধকদের সইতে হয়েছে। সেটা এইরকম। উপবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে তখন আমাদের দেশে বিজ্ঞানের চর্চা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ইউরোপ কিন্তু ততদিন এ বিষয়ে এক প্রজন্ম এগিয়ে গেছে। কূটবুদ্ধি ও বহুবুদ্ধিধারী ইংরেজ শাসককুল বুঝেছিলেন যে এই নবোদগত বিজ্ঞানবিদ্যা সভ্যজগতের চেহারা পালটে দিতে চলেছে। এর হাত ধরে আসছে প্রযুক্তি, অর্থ, ও ক্ষমতা। সুতরাং তারা ভেবেছিল এ বিদ্যা নেটিভদের না দেওয়াই ভালো। প্রচলিত শিক্ষানীতিতে সরাসরি এ কাজ করা যেত না। তাই শাসনযন্ত্রের স্তরে স্তরে গোপন সার্কুলার ছিল যেন মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অজানা ভৌগোলিক আবিষ্কারে এদেশীয়দের কোনোমতেই প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। ফলে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনায় পদে পদে প্রতিবন্ধকতা এসেছে। বার বার তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যাদি আগেভাগে অন্যত্র পাচার হয়ে গেছে! নাম হয়েছে অন্য লোকের, অন্য দেশের। এত কিছু সত্বেও তাঁর কাজের পরিমাণ বিশাল, এত যে তিনি করতে পেরেছিলেন তার পিছনে ছিল তাঁর নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি। আর দেশে বিদেশে বিদ্যানুরাগী মনীষীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। উনবিংশ বিংশ শতাব্দীসন্ধিতে পৃথিবীতে বিবেকী মানুষেরা আজকের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় ও শক্তিমান ছিলেন। বানিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি আজকের মত পুরোপুরি তাঁদের কণ্ঠরোধ করেনি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটারিতেই জগদীশচন্দ্র নিজের গবেষণার ক্ষেত্র বানিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে দুর্গামোহন দাশের কন্যা অবলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। বিদূষী ও তেজস্বী এই নারী ছিলেন জগদীশচন্দ্রের যোগ্য সহধর্মিনী এবং তাঁর সর্ব কর্মে সহায়। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ছিল দ্বিমুখী- পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক। গবেষণার জন্য অর্থাদি তখন সুলভ ছিল না। সরকারি সহায়তা ছিল যৎপরোনাস্তি স্বল্প ও অনিয়মিত। জগদীশচন্দ্র তাই গবেষণা চালিয়েছেন যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে। নিজের বেতনের সঙ্গে যোগ করেছেন বন্ধুরা যখন যা সাহায্য করেছে তাও। এই সাহায্যকারী বন্ধুদের মধ্যে তখনকার অনেক ধনবান ব্যক্তিই ছিলেন এটা বাঙালির সৌভাগ্য।

নানারকম ছোটখাট আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের পর প্রথম যে বড় কাজটি তিনি করেন তা বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিষয়ক। বেতার বিদ্যুতের সমতাপাদন (Ploarisation), বক্রীভবন (Refruction), ও পরাবর্তন (Reflection) ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে কাজ করে ১৮৯৫ সালে কলকাতার টাউন হলে একদিন হাতে কলমে পরীক্ষা করে সব দেখালেন। এরপর আবিষ্কার করলেন X RAY যন্ত্র। ডঃ নীলরতন সরকার সেই যন্ত্র ব্যবহার করে এশিয়ার মধ্যে প্রথম X RAY ব্যবহারকারী ডাক্তার হিসাবে পরিচিত হলেন।

এইসব যুগান্তকারী আবিষ্কারে জগদীশচন্দ্রের নাম বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে ছাড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ এল সেখানে গিয়ে বক্তৃতা করবার। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত বেতার তরঙ্গ পরিমাপক কোহেরার যন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে সেদেশে পাড়ি দিলেন। ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জার্মানীর বৈজ্ঞানিক সভায় তাঁর বক্তৃতা পরম সমাদরে গৃহীত হল। সফরশেষে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এসসি ডিগ্রি নিয়ে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন তাঁর ছাত্র, অধ্যাপক, বন্ধু বান্ধবেরা তাঁকে বিজয়ী বীরের অভ্যর্থনা জানালেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ নীলরতন সরকার, আনন্দমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। তাঁকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ শিখলেন বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে কবিতাটি।

দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দিলেন। সঙ্গে চলল গবেষণা। বিদ্যুৎ তরঙ্গ পরিমাপক যন্ত্রের নানা উন্নত প্রকারভেদ তৈরি করলেন তিনি। এছাড়াও আবিষ্কার করলেন খনিজ নির্দেশক ফোটোসেল যন্ত্রটি। এ নিয়ে তাঁর কোনো প্রচারও ছিল না, পেটেন্টও নেন নি।

সৃষ্টিসন্ধান

প্রেসিজেন্সি কলেজে তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে নানা বাধা আসত। একবার অভিযোগ উঠল তিনি ব্যক্তিগত কাজে ল্যাবরেটারি ব্যবহার করছেন। আর একবার অভিযোগ এল তিনি বহিরাগতকে (জনৈক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক) কলেজের ভিতর এনেছেন ইত্যাদি। এইসব ছোটখাটো ব্যাপারেও গবেষকের চিত্তস্থৈর্য নষ্ট হয় ও কাজের ব্যাঘাত ঘটে। এছাড়া বড় বড় অসুবিধা তো ছিলোই। তাই অনেকদিন থেকেই জগদীশচন্দ্র ভেবেছিলেন যে যদি বিজ্ঞানীদের স্বাধীন কাজের জন্য একটা নিজস্ব গবেষণাগার থাকত, তবে খুবই ভালো হত। তার প্রস্তুতি এবার সুরু করলেন।

ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র জড় পদার্থের মধ্যেও ভৌত রসায়নিক প্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। এ আবিষ্কার এযাবৎকাল প্রচারিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতিকূল বলে বিজ্ঞানীদের একাংশ এ মত মানতে চাননি। অবশেষে ১৮৯৯ সালে প্যারিসে পদার্থবিজ্ঞানীদের এক আন্তর্জতিক আলোচনাচক্র হলে তিনি সেখানে নিজ মত ব্যাখ্যার সুযোগ পেলেন। এরপরই শুরু হল তাঁর আর এক বৈপ্লবিক গবেষণা। যেখানে তিনি প্রমাণ করলেন উদ্ভিদজগতেও উত্তেজনার প্রক্রিয়ায় নানারকম বৈদ্যুতিক সাড়া আছে। এ পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নিজমত প্রমাণের ও প্রচারের জন্য তাঁকে বেশ কিছুকাল বিদেশে থাকতে হয়েছিল।

নিজের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জগদীশচন্দ্র নিজেই তৈরি করে নিতেন। দুর্মূল্য উপাদানে সেগুলি তৈরি হত না। যথাসম্ভব কম খরচে, সুলভ উপাদানে তৈরি, অথচ আশ্চর্য গুণসম্পন্ন এইসব যন্ত্রগুলির নামকরনও করতেন তিনি। প্রথমে নাম দিতেন মাতৃভাষায়, যেমন কুঞ্চনমান, শোষনমান প্রভৃতি। পরে দেখলেন এই নামকরণ আন্তর্জাতিক স্তরের বিজ্ঞানীদের বোধগম্য হচ্ছে না। তখন পাশ্চাত্য রীতিতেই তাদের নামকরণ করেছেন যথা কোহেরার, ক্রেস্কোগ্রাফ প্রভৃতি।

শেষ ফসল।।

জীবনের মধ্যপর্বে এসে জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন তাঁর এতদিনের কাজগুলিকে বইয়ের আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। তিনি সর্বমোট চোদ্দটি বই লেখেন। সবই তাঁর গবেষণা ভিত্তিক। কেবল একটি বাংলা বই তাঁর আছে। সেটি বিশেষজ্ঞের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকের জন্য। তার বিষয়বস্তুও ঠিক বিজ্ঞান নয়, দর্শন বিজানের সমন্বয় বলা যেতে পারে। তাঁর প্রধান বইগুলি হল।

১. Response in the Living and Non-living, 1902
২. Plant response as a means of physiological investigation, 1906
৩. Comparative Electro-physiology: A Physico-physiological Study, 1907
৪. Researches on Irritability of Plants, 1913
৫. Physiology of the Ascent of Sap, 1923
৬. The physiology of photosynthesis, 1924
৭. The Nervous Mechanisms of Plants, 1926
৮. Plant Autographs and Their Revelations, 1927
৯. Growth and tropic movements of plants, 1928
১০. Motor mechanism of plants1928
১১. Abyakta (Bangla), 1922

বই লেখবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের নানাস্থানে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার নানাস্থানে তাঁর বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন।

অবশেষে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তাঁর জন্মদিনে তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন এই উদ্দেশ্যে তিনি অক্লান্ত শ্রমে এটি গড়ে তুললেন। এ কাজে তিনি ছোটবড় নানা লোকের সাহায্য পেয়েছেন। মূলত : সাধারনের দানেই এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল। দাতাদের মধ্যে ২ লক্ষ টাকা থেকে ১ টাকা পর্যন্ত কোনও দাতাকেই জগদীশচন্দ্র অস্বীকার করেন নি। তাদের তালিকা প্রস্তুত করেছেন দানের পরিমান অনুসারে নয়। কালানুক্রমে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি তত্বাবধায়ক সমিতি তৈরি হয়। সমিতির সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুধাংশুমোহন বসু, সতীশরঞ্জন দাশ ও জগদীশচন্দ্র নিজে। কর্মধারা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেজন্য এর অধীনে একটি নিয়ামকমণ্ডলী ছিল। দেশীয় দক্ষ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশেষভাবে এই নীতি ঘোষিত ছিল যে বিজ্ঞান মন্দিরের কোনো ব্যাপারে সরকারের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না।

বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন এই বিখ্যাত গানটি— মাতৃমন্দির পুন্য অঙ্গন করো মহোজ্বল আজ হে— আর উদ্বোধনী ভাষণে জগদীশচন্দ্র নানা কথার সঙ্গে বললেন এই কথাগুলি—

''আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির। কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে।...কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে : সে উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে।...

বিলাতের ন্যায় এদেশের পরীক্ষাগার নাই। সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মানও এদেশে কোনোদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে সেই কেবল বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি। সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে।

যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে?— জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই যে, যেদিন হইতে আমাদের বাঁচিবার ইচ্ছা স্থগিত হয়, সেইদিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধেও একই কথা। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে, এবং বাড়িতে হইবে।

সৃষ্টিসন্ধান